পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

www.pksf.org.bd

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে উদ্‌যাপিত 'জেন্ডার বৈষম্য নিরসনে ডিজিটাল প্রযুক্তি' শীর্ষক সেমিনারের কার্যবিবরণী

পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
৮৮-০২২২২২১৮৩৩১-৩৩, ০২২২২২১৮৩৩৫-৩৯
৮৮-০২২২২২১৮৩৪১, ০২২২২২১৮৩৪৩
pksf@pksf.org.bd
facebook.com/pksf.org
youtube.com/@PKSF1990

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

www.pksf.org.bd

"ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন
জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন।"

অনুষ্ঠানসূচি

'আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৩' উপলক্ষ্যে
"জেন্ডার বৈষম্য নিরসনে ডিজিটাল প্রযুক্তি" বিষয়ক সেমিনার
তারিখ: ১৯ মার্চ ২০২৩, সময়: সকাল ১১:০০ ঘটিকা
স্থান: মিলনায়তন-১, পিকেএসএফ ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
অংশগ্রহণকারী: পিকেএসএফ-এর মূলস্রোত ও প্রকল্পভুক্ত সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

সময়	কার্যক্রম	
১০:৩০-১১:০০	**নিবন্ধন, আপ্যায়ন ও অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহণ**	
১১:০০-১১:০৫	**স্বাগত বক্তব্য**	**ড. নমিতা হালদার** এনডিসি ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ
১১:০৫-১১:২০	**উপস্থাপনা প্রদান**	**উপস্থাপনার বিষয়:** "পরিবার ও কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতার চর্চা এবং জেন্ডার বৈষম্য নিরসনে ডিজিটাল প্রযুক্তি" **জনাব মোসলে রুম্মান,** উপ-ব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ
১১:২০-১১:৪০	**প্যানেল আলোচনা**	১. **জনাব আফরোজা খান** ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জয়িতা ফাউন্ডেশন (সাবেক সচিব)
		২. **জনাব মোঃ ফজলুল কাদের** অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, পিকেএসএফ
১১:৪০-১২:০০	**মুক্ত আলোচনা**	
১২:০০-১২:১০	**অতিথি বক্তার বক্তব্য**	**জনাব সোনিয়া বশির কবির** ভাইস চেয়ার ও গভর্নিং কাউন্সিল মেম্বার, ইউনাইটেড ন্যাশনস টেকনোলজি ব্যাংক
১২:১০-১২:২০	**চেয়ারপার্সন-এর বক্তব্য**	**ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ** চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ

পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
৮৮-০২২২২২১৮৩৩১-৩৩, ০২২২২২১৮৩৩৫-৩৯
৮৮-০২২২২২১৮৩৪১, ০২২২২২১৮৩৪৩
pksf@pksf.org.bd
facebook.com/pksf.org
youtube.com/@PKSF1990

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

www.pksf.org.bd

১.০ ভূমিকা:

বিগত ১৯ মার্চ ২০২৩ তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় পিকেএসএফ ভবনের মিলনায়তন-১-এ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে 'জেন্ডার বৈষম্য নিরসনে ডিজিটাল প্রযুক্তি' শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে চেয়ারপার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর সম্মানিত চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। সেমিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন জনাব আফরোজা খান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জয়িতা ফাউন্ডেশন এবং জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, পিকেএসএফ । এছাড়া, অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সোনিয়া বশির কবির, ভাইস চেয়ার ও গভর্নিং কাউন্সিল মেম্বার, ইউনাইটেড ন্যাশন্স টেকনোলজি ব্যাংক। সেমিনারে 'পরিবার ও কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতার চর্চা ও জেন্ডার বৈষম্য নিরসনে ডিজিটাল প্রযুক্তি' বিষয়ের ওপর উপস্থাপনা প্রদান করেন জনাব মোসলে রুম্মান, উপ-ব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ। উল্লেখ্য, পিকেএসএফ এর মূলস্রোত ও প্রকল্পভুক্ত সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

২.০ স্বাগত বক্তব্য:

ড. নমিতা হালদার এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ ।

বক্তব্যের শুরুতে ড. নমিতা হালদার এনডিসি, পিকেএসএফ-এর সম্মানিত চেয়ারম্যান, সেমিনারের উপস্থিত অতিথি বক্তা, প্যানেলিস্টবৃন্দ এবং সর্বস্তরের সহকর্মীবৃন্দকে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে সকলকে সেমিনারে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, প্রতি বছরের মতো এবারও আমরা নারী দিবস উদ্‌যাপনের জন্য একসঙ্গে মিলিত হয়েছি। নারী দিবসের এবছরের প্রতিপাদ্য 'DigitALL: লিঙ্গ সমতার জন্য উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি'। এই প্রতিপাদ্যের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে যে আমরা যদি নারীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারি তাহলেই বৈষম্য নিরসন হবে। আমরাও বিশ্বাস করি নারীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কিছুটা হয়ত বৈষম্য নিরসন হবে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে কি সবাই ডিজিটাল হতে পারবো? আমাদের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ৫/খ-এ উল্লেখ রয়েছে যে যখন শতভাগ নারী মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবে তখনই তথ্যপ্রযুক্তিতে নারীকে স্বয়ংসমৃদ্ধ বলা যাবে। কিন্তু এবারের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য অনুযায়ী শুধু মোবাইল ফোন ব্যবহার করা, কল করা বা রিসিভ করাই বৈষম্য নিরসনে যথেষ্ট নয়। এবারের প্রতিপাদ্য অনুযায়ী প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আরো বেশি সক্ষমতা অর্জন করতে হবে, ইন্টারনেট ব্যবহার করতে জানতে হবে। এখন পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি এবং সে কারণেই এই ধরনের একটি প্রতিপাদ্য এসেছে।

আমাদের ছেলে-মেয়ে উভয়কেই সমভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে অভ্যস্ত করতে হবে। সেই সাথে ডিজিটাল প্রযুক্তির নেতিবাচক দিকগুলোর বিষয়েও তাঁদেরকে সচেতন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অনলাইনে যে সমস্ত নিরাপত্তার হুমকি আছে, সাইবার ক্রাইম আছে, যে সমস্ত কাজে মেয়েদেরকে অনলাইনে হয়রানি করা হয়, সেই সমস্ত বিষয়ে ছেলে-মেয়ে উভয়কেই সচেতন করতে হবে, প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আমাদের সচেতনতার অভাবে সাইবার জগতের অনেক অপরাধের সঙ্গে মেয়েরা নিজের অজান্তে বিভিন্নভাবে সহিংসতার শিকার হচ্ছে। যদি আমরা সত্যিকার অর্থে লিঙ্গ সমতা আনতে চাই তাহলে মেয়ে বা নারীদেরকে প্রযুক্তির বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান ও সচেতন করার পাশাপাশি তাঁরা যেন প্রযুক্তি দ্বারা নির্যাতনের ও হেনস্তার শিকার না হয় সেই বিষয়েও তাঁদের সচেতন করতে হবে। পিকেএসএফ-এর সহকর্মীরা অত্যন্ত সচেতনভাবে পিকেএসএফ এর প্রতিটি কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে জড়িত ফলে তাঁদেরও ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে লিঙ্গ সমতা অর্জনে একটি গুরুদায়িত্ব রয়েছে । প্রতিটি মানুষকে যার যার জায়গায় থেকে নারী সমাজকে, নিজেদের কন্যা সন্তানকে এমনকি পুত্র সন্তানদেরও প্রযুক্তির ব্যবহার এবং প্রযুক্তিটি নিরাপদ করার বিষয়ে সচেতন করতে হবে। সবশেষে তিনি উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

পৃষ্ঠা নং-৩

৩.০ 'পরিবার ও কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতার চর্চা ও জেন্ডার বৈষম্য নিরসনে ডিজিটাল প্রযুক্তি' বিষয়ে উপস্থাপনা: জনাব মোসলে রুম্মান, উপ-ব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ।

জনাব মোসলে রুম্মান তাঁর উপস্থাপনার শুরুতে মঞ্চে উপবিষ্ট সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি, পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্যানেল আলোচকবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথি এবং সহকর্মীবৃন্দকে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানান।

তিনি বলেন, নারী দিবস উদ্‌যাপনের ইতিহাসের শুরুটা শ্রমজীবী নারীর সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ যখন নারীদের কাজের কোন নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা ছিল না, কাজের পরিবেশ অনিরাপদ ছিল এবং পুরুষদের সাথে তাঁদের মজুরির বৈষম্য ছিল। ১৮৫৭ সালে আমেরিকার নিউইয়র্কে প্রথম একটি গণজমায়েত হয় যেখানে নারীরা তাঁদের এই অধিকারগুলো নিয়ে সোচ্চার হন। এর প্রায় ৫০ বছর পরে ১৯০৯ সালে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিন প্রথম একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করেন যেখানে এই অধিকারের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়। এর পরের বছরই ১৯১০ সালে নিউইয়র্কের একটি তৈরি পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ঘটে। তখনকার সময় বুর্জোয়া অধিপতি এবং যারা কারখানার মালিক ছিলেন তাঁরা একটি নির্দিষ্ট সময়ের আগে কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে কারখানা হতে বের হতে দিতেন না। সেই সময়ের অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ১২৯ জন নারী মর্মান্তিকভাবে নিহত হন। তাঁদের শেষকৃত্যানুষ্ঠানে প্রায় দশ হাজারের বেশি মানুষ যোগ দেন। ক্লারা জেটকিন এই ইস্যুগুলো নিয়ে আবার দ্বিতীয় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন করেন। সেখানে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে প্রায় ১০০ জন নারী প্রতিনিধি ১৭টি দেশ থেকে আসেন এবং তাঁরা ৮ মার্চ দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করার জন্য একটা প্রস্তাবনা দেন। এর দীর্ঘদিন পরে ১৯৭৭ সালে জাতিসংঘ বিষয়টিকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয় এবং সেই সময় থেকেই নারী দিবস আন্তর্জাতিকভাবে উদযাপিত হয়ে আসছে। নারী অধিকারের যে বৈচিত্র্য তা কিন্তু একেক অঞ্চলে একেক রকম। কোন অঞ্চলে যখন নারীরা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মতো একটি বিষয় নিয়ে লড়াই করছেন, ভোটাধিকার নিয়ে লড়াই করছেন। বিশ্বের অন্য কোথাও পিছিয়ে পড়া কোনো দেশে দেখা যাচ্ছে যে, নারীরা শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকার অর্জনে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। একারণে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতি বছরই একটি প্রতিপাদ্য থাকে। জাতিসংঘ এই বিষয়গুলোকে সকলের সামনে তুলে ধরতে চায় যেন এই বিষয়গুলো সবাই উপলব্ধি করতে পারে। সেই বাস্তবতায় ২০২৩ সালে প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে 'DigitALL: Innovation and technology for gender equality'। আর এই বৈশ্বিক প্রতিপাদ্যের সাথে সংহতি রেখে বাংলাদেশে নির্ধারণ করা হয়েছে- 'ডিজিটাল প্রযুক্তি উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন'।

জনাব রুম্মান তাঁর উপস্থাপনায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে "Embrace Equity" এই শব্দদ্বয়ের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে আমাদের অর্জন অনেক। তথ্যপ্রযুক্তিতে আমরা নিঃসন্দেহে অনেক প্রশংসনীয় অবস্থানে এসেছি। গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্স-এ বিশ্বের ১৩২টি দেশের মধ্যে আমাদের অবস্থান ১০২তম। শেষ দুই বছরে আমরা প্রায় ১৪ পয়েন্ট এগিয়েছি, যেটা প্রশংসার দাবি রাখে। ২০১৫ সালে ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন থেকে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি 'আইসিটি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট' পুরস্কার অর্জন করেছে। এছাড়া আরো অনেক স্বীকৃতি এবং সম্মাননা বাংলাদেশের ঝুলিতে রয়েছে। আমরা আত্মপ্রশংসা করবো কিন্তু পাশাপাশি আত্মসমালোচনা করারও দরকার আছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রায় ৩০ শতাংশ নারী অধ্যয়ন করছেন। এই ৩০ শতাংশ নারীর মধ্যে কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত আছেন মাত্র ১৫ শতাংশ। দুঃখের বিষয় হলো যারা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে কাজ করছেন তাঁদের সংখ্যা এক শতাংশেরও নিচে। আমাদের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে কর্মক্ষেত্রের সুযোগ অন্যান্য যেকোনো খাতের থেকে বেশি। সেই সম্ভাবনার পশ্চাতে নারীর অংশগ্রহণ আসলে সেভাবে আমরা দেখতে পাইনা। ২০২২ সালের জিএসএম-এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে পুরুষের তুলনায় ২৩ শতাংশ নারী মোবাইল ফোন কম ব্যবহার করছেন। আমরা জানি, অনেককে পরিবার থেকে মোবাইল ফোন ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়না। যেখানে ২ শতাংশ পুরুষ এই অনুমতি পাচ্ছে না সেক্ষেত্রে নারীর ক্ষেত্রে এই বৈষম্যের পরিমাণ ১৩ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২২ সালের প্রাথমিক প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে, মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর ৩৭ শতাংশের মধ্যে পুরুষ ব্যবহারকারী ৪৬ শতাংশের মতো। কিন্তু নারী সেখানেও ১৮ শতাংশের মতো পিছিয়ে আছে।

পৃষ্ঠা নং-৪

জাতিসংঘ ২০৫০ সাল নাগাদ একটি পূর্বাভাস দিয়েছে যে, আগামী দিনে যত চাকরি, যত ধরনের পেশা সেগুলো মূলত তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর হবে। এই তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর চাকরির ক্ষেত্রে আমাদের নারীরা যে বৈষম্যের অবস্থানে আছে সেটা চলমান থাকলে সেক্ষেত্রে আমাদের চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। ১৯৭১ সালে আমরা যখন স্বাধীনতা অর্জন করি, আমাদের জিডিপি ছিল মাত্র ৮.৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২১ সালে বিশ্বব্যাংকের তথ্য মতে সেটা ৪১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। আমাদের জিডিপির যে আকার, সেই তুলনায় এটা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। তারপরও আমাদের অনেক কিছু এখনো অর্জন করার বাকি রয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে মাত্র ৩৮ শতাংশ নারী নিয়োজিত রয়েছেন। কিন্তু এই ৩৮ শতাংশ নারীর মধ্যে বেশিরভাগ অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রি, নিম্নমানের কাজ এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলোর সাথে নিয়োজিত রয়েছেন। গৃহকর্মে যে কাজগুলো করা হয় সেগুলোর কখনোই আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন বা স্বীকৃতি ছিল না। এগুলোকে আমরা আনপেইড ডমেস্টিক ওয়ার্ক অথবা কেয়ার ওয়ার্ক বলি। এই বিষয় নিয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর গবেষণায় দেখা যায় যে, একজন পুরুষ যেখানে গৃহকর্মে দিনে দুই ঘণ্টার কম সময় ব্যবহার করে, সেখানে একজন শ্রমজীবী নারীকে ঘর ও বাইরের কাজের জন্য প্রায় ১২ ঘণ্টার কাছাকাছি সময় ব্যয় করতে হয়। সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ একটি গবেষণায় দেখিয়েছে যে, বাংলাদেশের জিডিপিতে ২০ শতাংশের মত নারীর অবদান আছে। কিন্তু এই কাজগুলোকে আমরা স্বীকৃতি দেই না। এ কাজ যদি অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেটার অংশ দাঁড়াবে প্রায় ৪৮ শতাংশ। অর্থাৎ নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, বাংলাদেশের জিডিপিতে যে রকম পুরুষের অবদান, ঠিক একই রকম নারীরও অবদান রয়েছে।

আমরা যারা কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত রয়েছি আমাদের দিনের বেশিরভাগ সময় অফিসে এবং পরবর্তী সময়টা বাসায় ব্যয় করি। যখন কর্মক্ষেত্রে থাকি তখন কিছু জেন্ডার ইনসেনসিটিভ বা অসংবেদনশীল আচরণ করে থাকি। যেগুলো নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে ব্যথিত করে, সবাইকে পীড়া দেয়। যখন একজন নতুন নারী সহকর্মী নিযুক্ত হন, তাঁকে আমরা জিজ্ঞেস করি পরিবারে কে কে আছে? আপনার বিয়ে হয়েছে কিনা ইত্যাদি। এই একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়গুলো পেশাদারি কোনো আচরণ না। এই বিষয়গুলো হয়ত আমাদের সংস্কৃতিতে বিদ্যমান, কেননা আমরা আন্তরিকতার সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করি। তবে পেশাদারিত্বের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। অনেক অফিসেই একজন নারীকে কোনো একটা বিভাগে বদলি করা হলে কিংবা পদোন্নতি দেওয়া হলে তাঁর যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একটু সচেতন থাকতে পারি। বেশিরভাগ সময়ে নারীরাই দাপ্তরিক ছুটি নেন সন্তানের অসুস্থতার জন্য। সন্তান অসুস্থ হলে নারীকেই কেন ছুটি নিতে হবে? পুরুষও তো নিতে পারেন, তিনিও তো বাবা। এখানে তাঁর সমান দায়িত্ব রয়েছে। খুব দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, যখন কোনো একটা অফিসে জেন্ডার স্পেশালিস্ট নিয়োগ করা হয়, পেছনে তাঁকে বলা হয় 'জেন্ডার আপা' যা আসলে অসংবেদনশীল আচরণ। জেন্ডার আলোচনায় শুধু নারী কেন্দ্রিক আলোচনা করা ঠিক নয়। একজন পুরুষ যখন তাঁর নির্ধারিত কর্মঘণ্টার বাইরে কাজ করছে, তাঁকে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে যে, জনাব অমুক আপনি অফিসে থাকেন। এই কাজটা শেষ করে যান। নারীকে হয়ত আগে আগে বাসায় যাওয়ার অনুমতি দেয়া হচ্ছে। একজন পুরুষেরও কিন্তু পরিবার আছে। তাঁরও সন্তান-সন্ততি, বাবা-মা, দায়িত্ব-কর্তব্য আছে। অর্থাৎ জেন্ডার শুধু নারীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে, এ রকম না, পুরুষের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য।

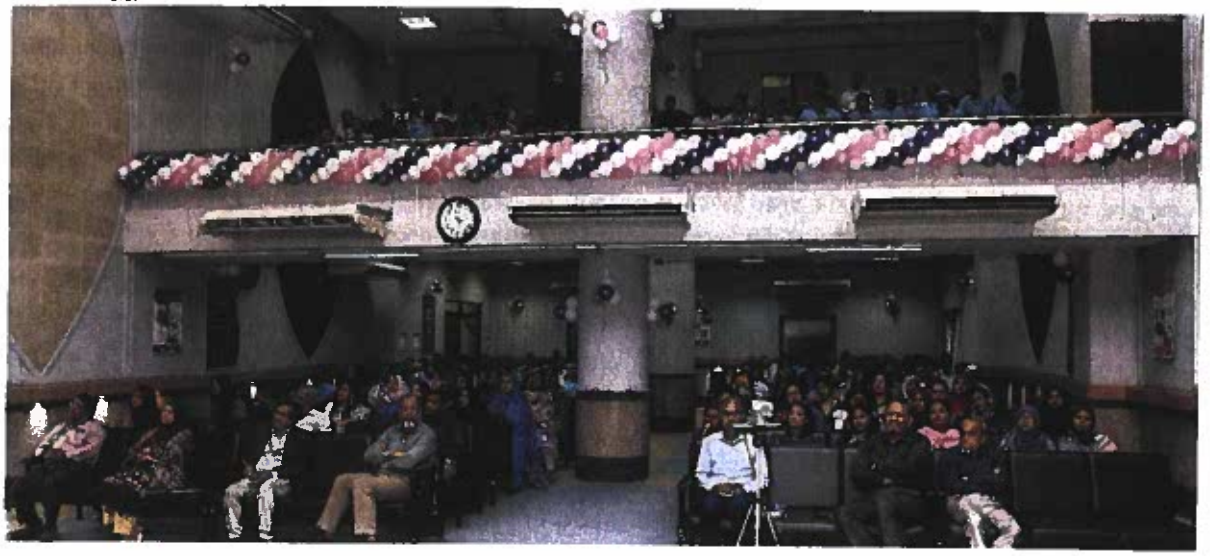

পৃষ্ঠা নং-৫

পরিবার আমাদের মানসিক বিকাশের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র । জেন্ডার বৈষম্যের প্রাথমিক চর্চাগুলো পরিবার থেকেই হয়। আমরা পারিবারিক কোনো কাজ ছেলে এবং মেয়েদের জন্য পৃথকভাবে নির্ধারণ করে দিই। এই বিষয়টিকে জেন্ডার রোল বা জেন্ডার আইডেন্টিটি বলা হয়। যেমন ছেলেরা বাইরের কাজগুলো করবে, তাঁদের ঘরের কাজ করার দরকার নেই। মেয়েরাই মূলত গৃহস্থালি কাজগুলো করবে। এগুলো আলাদা করে দিয়ে এটার মাধ্যমে কিন্তু আনপেইড লেবার প্রমোট করছি। অর্থাৎ একজন কর্মজীবী নারী অফিস শেষ করে আবার সেই গৃহস্থালি কাজগুলোতে নিয়োজিত থাকবেন। পুরুষ সদস্যের সেটা না করলেও চলে। এই জায়গাগুলোতে পরিবার ভীষণ রকমের বৈষম্য চর্চা করে। যখন উচ্চশিক্ষা অর্জনের প্রশ্ন আসে বা কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত হওয়ার প্রশ্ন আসে, তখন ছেলেকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, মেয়েকে নয়। কারণ মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে, মেয়ে অন্যের ঘরে চলে যাবে, তাই দরকার নেই। তার চেয়ে ছেলে শিক্ষিত হোক, প্রতিষ্ঠিত হোক, সেটা বেশি প্রয়োজন।

আমরা আরেকটা ন্যাক্কারজনক কাজ করি। তা হচ্ছে নির্যাতিত ব্যক্তির ওপর দায় চাপানো। একটি কিশোরী যখন বয়ঃসন্ধিকাল অতিক্রম করে, তাঁর শারীরিক মনোদৈহিক বিভিন্ন পরিবর্তন আসে সেজন্য তাঁকে বিভিন্ন অনুশাসন মেনে চলার জন্য পরিবার থেকে বাধ্য করা হয়। তাঁকে ভিড়ের মধ্যে খুব সাবধানে থাকতে হবে, এটা করা যাবে, ওটা করা যাবে না। এই অনুশাসন আর নিরাপত্তার বলয়ের মধ্যে তাঁকে বড় করা হয়। আমরা কিন্তু আমাদের ছেলে সন্তানকে সেইভাবে বড় করি না। সেভাবে কিন্তু বলি না যে, সে তোমার বোন। তাঁর নিরাপত্তা তোমাকে নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকা দরকার। আমাদের মেয়ে যখন গণপরিবহনে ওঠে, তখন সে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। এই ব্যাপারগুলোতে আমাদের পুরুষ এবং আমাদের পুত্র সন্তানদেরও সমানভাবে সংবেদনশীল করার প্রয়োজন আছে।

কর্মক্ষেত্রে নারীকে যৌন হয়রানি থেকে নিরাপত্তা প্রদানের জন্য পিকেএসএফ এর চাকরি বিধিমালা ও জেন্ডার নীতিমালা রয়েছে। পিকেএসএফ হতে প্রতি বছরই এর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে জেন্ডার বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়। আমাদের একটি ডে-কেয়ার সেন্টার আছে। সেখানে আমাদের সহকর্মীবৃন্দ ডে-কেয়ারের সুবিধা নিতে পারছেন। এছাড়া, নারী সহকর্মী যখন ট্যুরে যান, তাঁদের নিরাপত্তার বিষয়টি সব সময় প্রথম অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। এখন আমাদের প্রয়োজন সকল কর্মসূচি, প্রকল্প এবং মূলস্রোতের কার্যক্রমের সকল কর্মসূচিতে জেন্ডার সংবেদনশীলতা গ্রহণ করা। কারণ এটি ছাড়া আমরা যে লক্ষ্য অর্জন করতে চাচ্ছি, সেটা অর্জন করা সম্ভব না। আমরা যখন ডিজিটাল প্রযুক্তির কথা বলছি, ডিজিটাল প্রযুক্তি সত্যিই বৈষম্য নিরসন করতে পারবে কি না তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। অবশ্যই ডিজিটাল প্রযুক্তি জেন্ডার বৈষম্য নিরসনে ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু আমাদের যে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা সেই জায়গা থেকে আমাদের সমালোচনা করার প্রয়োজন আছে।

আজকের সেমিনার শেষে অনেকে হয়ত কটাক্ষ করে বলবেন যে, বক্তা একজন বিশিষ্ট নারীবাদী। এক্ষেত্রে বলতে চাই, আপনার বোন গণপরিবহনে ওঠার সময় যদি কোনো হয়রানির শিকার হন এবং এই ব্যাপারটি যদি আপনাকে ব্যথিত করে, আপনি যদি মনে করেন, এর পরিবর্তন হওয়া উচিত, তাহলে আপনিও আমার মতো একজন নারীবাদী। আপনি যদি মনে করেন, আপনার পরিবারে যে-সব নারী সদস্য চাকরিতে নিয়োজিত আছেন, তাঁরা পেশাগত কাজের পাশাপাশি কেয়ার ওয়ার্কের জন্য গলদঘর্ম হচ্ছেন এবং এখানে পরিবর্তন আনার প্রয়োজন আছে, তাহলে আপনিও একজন নারীবাদী। নারীবাদ মানে কিন্তু পুরুষ বিদ্বেষ নয়। অর্থাৎ পুরুষের বিরোধিতা করা নারীবাদী চিন্তার মধ্যে পড়ে না। এই জায়গাগুলোতে আমাদের একটু সংবেদনশীল হওয়ার প্রয়োজন আছে। ডিজিটাল মিডিয়াতে নারীরাই সর্বাধিক হয়রানির শিকার হন। আমি ব্যক্তিগতভাবে যখন কোনো হাস্যরসাত্মক কনটেন্ট দেখি, যেগুলোতে নারীকে হেয় করা হয়-সেগুলো আমি এড়িয়ে যাই। আমি কখনো সেখানে হা হা রিঅ্যাকশন দিয়ে শেয়ার করি না। কারণ এই বিষয়গুলো আপনি যত শেয়ার করবেন, যত প্রমোট করবেন, মানুষের ভেতরের যে ইন্টার্নাল মেকানিজম সেগুলো আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে যাবে। মানবিক সংকট তৈরি হবে। ডিজিটাল প্রযুক্তির সাথে সাথে আমাদের ত্রুটিপূর্ণ সামাজিকীকরণ যদি আমরা পরিবর্তন করতে পারি, অবশ্যই ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং ইনোভেশন আমাদের অনেক দূর এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে।

জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্সে আমাদের স্কোর হচ্ছে ০.৭। যেটা ২০২২ সালে ১৪৬টি দেশের মধ্যে ৭১তম। আমাদের সামাজিকীকরণ, জেন্ডার বিষয়ক আলোচনা যত বেশি হবে, তত বেশি জেন্ডার স্টেরিওটাইপ ধরনের কথাগুলোকে আমরা প্রশ্ন তুলতে পারবো। আশা করি, আমাদের এই স্কোর আরও উন্নত হবে। আমি বিশ্বাস করি, এই বিষয়গুলো যদি আমরা নিশ্চিত করতে পারি, অচিরেই বাংলাদেশ জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স-এ জিরোর কাছাকাছি যাবে। সেই জন্য সাম্যের ধারণা আত্তীকরণ করার মনোভাব আমাদের সবার প্রয়োজন। এটি করতে পারলে আমরা আরও ভালো করতে পারবো। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে জনাব মোসলে রুম্মান তাঁর উপস্থাপনা শেষ করেন।

পৃষ্ঠা নং-৬

৪.০ প্যানেল আলোচনা:

প্যানেলিষ্ট -১: জনাব আফরোজা খান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জয়িতা ফাউন্ডেশন (সাবেক সচিব)।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে প্যানেল আলোচনায় প্রথমে বক্তব্য রাখেন জনাব আফরোজা খান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জয়িতা ফাউন্ডেশন। তিনি এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত চেয়ারপার্সন ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, ড. নমিতা হালদার এনডিসি, অতিথি বক্তা এবং উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর আয়োজনে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোয় তিনি নিজের এবং তাঁর সংগঠন জয়িতা ফাউন্ডেশন-এর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি প্রথমেই সেমিনারের মূল পেপার উপস্থাপক জনাব মোসলে রুম্মানকে ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন, জনাব মোসলে রুম্মান এতো সুন্দরভাবে সব তথ্য তুলে ধরেছেন যে তাঁর বক্তব্য শুনে মনে হয়েছে তিনি আমাদের সংবেদনশীল করতে পেরেছেন। আমরা নিজেরাও হয়ত লিঙ্গ সাম্যতার বিষয়ে ওভাবে কখনো চিন্তা করি নাই। এ বছরের বিশ্ব নারী দিবসে নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনের ওপর জোর দেয়া হয়েছে এবং থিম হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে 'প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে লিঙ্গ সাম্য তৈরি করা'। নারীর প্রতি বৈষম্য সমস্যাটি সার্বজনীন। ইউক্রেনের যুদ্ধে উদ্বাস্তু হওয়া নারী থেকে শুরু করে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গা নারী, আফ্রিকার খরাপীড়িত এলাকার নারী থেকে শুরু করে তুরস্ক ও লিবিয়ায় ভূমিকম্পে সম্বলহীন হয়ে পড়া নারীরা, কেউই এর থেকে আলাদা নয়। এমনকি বৈশ্বিক সংকটে যখন বাংলাদেশের মানুষ চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হিমশিম খাচ্ছে, তখন সবচেয়ে উপেক্ষিত হচ্ছে নারী ও শিশুরা। ঘরে-বাইরে নারীর অধিকার অর্জনে আমাদের প্রচেষ্টা কিন্তু থেমে নেই।

জাতিসংঘের নবম মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন যে, নারী সাম্য নিশ্চিত করতে আমরা বর্তমানে যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছি সেই পথে চললে লক্ষ্য অর্জনে আরও ৩০০ বছর সময় লেগে যাবে। এক্ষেত্রে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ওপর জোর দেয়া ছাড়া আমাদের আর কোন বিকল্প নেই। আজকের বাংলাদেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে। স্মার্ট বাংলাদেশের হাতিয়ার হচ্ছে প্রযুক্তি। নারীর প্রতি সাম্য আনতে গেলেও আমাদের এই পথেই এগিয়ে যেতে হবে। এরই মধ্যে আপনারা জেনেছেন যে, ২০২২ সালের জনশুমারি আমাদের তথ্য-উপাত্ত দিয়ে দেখিয়েছে যে, বাংলাদেশে এখন নারীর সংখ্যা পুরুষের থেকে বেশি। দেশে ৮ কোটি ১৭ লাখ পুরুষের বিপরীতে ৮ কোটি ৩৩ লাখ নারী রয়েছে। নারীকে উন্নয়নের স্রোতধারায় আনতে না পারলে যেমন সাম্য আসবে না, তেমনি উন্নয়ন হবে না। দেশের ৮৭ শতাংশ পুরুষ যখন মোবাইল ব্যবহার করে তখন নারীরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে ৫৯ শতাংশ। প্রযুক্তিক্ষেত্রে সাম্যতা আনতে না পারলে আমরা সার্বিক অর্থে নারীর প্রতিও সাম্য আনতে পারবো না।

আগের বক্তা বলেছেন যে, পিকেএসএফ-এ ডে-কেয়ার আছে। এটি একটি জরুরি বিষয় নারীর জন্য। তিনি আরো বলেছেন যে, সন্তানের কারণে ছুটি নিতে গেলে নারীরা সবসময় সংকুচিত হয়ে যান। কারণ পুরুষ সহকর্মী এ কারণে কখনোই ছুটি নেন না। তাঁরা সবসময়ই উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে খুব ভালো। কিন্তু সন্তানের অসুস্থতায় সবসময় নারীকেই কেন ছুটি নিতে হয়! শুধু সন্তান নয়, পেশার পাশেও আমাদের পারিবারিক যে জীবন আছে, সেখানেও নারীদের অনেক বেশি সামাজিক দায়িত্ব থাকে পুরুষদের তুলনায়। সেই সামাজিক দায়িত্ব নারীরা সানন্দে পালন করেন। আমি মনে করি, সৃষ্টিকর্তাই পুরুষদের চাইতে নারীর শক্তি অনেক বেশি দিয়েছেন। শারীরিক ও মানসিক সব দিক থেকে নারীরা অনেক বেশি কাজ করতে পারেন। নারীদের শুধু পুরুষ সহকর্মীদের একটু সহমর্মিতা প্রয়োজন, সহযোগিতা প্রয়োজন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আশীর্বাদ এবং মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বলিষ্ঠ সহযোগিতায় জয়িতা ফাউন্ডেশন ১৬ নভেম্বর ২০১১ তারিখ থেকে কাজ করে আসছে। জয়িতা ফাউন্ডেশন নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে লিঙ্গ সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ প্রক্রিয়া আরো ত্বরান্বিত করার জন্য, নারীর প্রতি বিশেষ অগ্রাধিকার বিবেচনা প্রদানের মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য এবং নারী উদ্যোক্তাদের জন্য দেশব্যাপী একটি আলাদা নারীবান্ধব বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে।

পৃষ্ঠা নং-৭

জয়িতা ফাউন্ডেশন-এর পক্ষ থেকে নারী উদ্যোক্তা, নারী ব্যবসার জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। জয়িতা তার নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ই-জয়িতা নামে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে। যেখানে নারী উদ্যোক্তারা অনলাইনে তাঁদের ব্যবসা পরিচালনা করছেন এবং ফেসবুকে, হোয়াটসঅ্যাপে, গ্রুপে তাঁদের পণ্যের বাজার তৈরি করছেন। কিন্তু এখনো আমরা বাংলাদেশের সব নারীকে এই সেবার আওতায় আনতে পারিনি। উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির সুফল নারীর কাছে পৌঁছে দিতে না পারলে আমরা জানি যে এটা কখনো সম্ভব হবে না। এজন্য আমি মনে করি, প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই।

আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলে গেছেন যে, গণপরিবহনে আমাদের নারীরা নানান রকমের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। মেয়েরা যে কর্মক্ষেত্রে যাবে, সেই পরিবহন ব্যবস্থায়ও অনেক চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। এ বিষয়টি চিন্তা করে জয়িতা ফাউন্ডেশন খুব সহজ শর্তে নারীদেরকে স্কুটি ঋণ দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে যাতে নারীর পথ চলাটা সহজ এবং মসৃণ হয়। আমরা আশা করছি যে, খুব শীঘ্রই আমরা স্কুটি লোন প্রদান করতে পারবো। স্বাধীনভাবে চলার শক্তি এবং স্বস্তি নারীকে আত্মবিশ্বাসী করবে। তাঁর কর্মক্ষেত্রে যাওয়া বা তাঁর যেকোনো কাজ করতে বাইরে বেরোনোর ক্ষেত্রে অসীম একটি সাহস যোগাবে বলে আমরা মনে করি। আমি বিশ্বাস করি, আমার মতো আরো অনেকে নারীর ক্ষমতায়নের কথা ভাবছেন, নারীর জন্য কাজ করছেন। আমরা যদি সম্মিলিতভাবে একে অন্যের সহায়ক হয়ে কাজগুলো করি তাতে আরো গতি আসবে। প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনী ভাবনার মাধ্যমে আমরা একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারি। এভাবে ছোট ছোট স্বপ্নগুলো আমাদের নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা পালন করুক, এটাই আমার চাওয়া।

সাম্যের যে স্বপ্ন জাতিসংঘ দেখছে, সে স্বপ্ন অনেক আগেই আমাদের মনে গেঁথে দিয়েছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তিরিশ লক্ষ শহিদ, লক্ষ লক্ষ নারীর অবর্ণনীয় ত্যাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। আজকে একাত্তরের সেই উত্তাল মার্চের দিনগুলো স্মরণ করে, তাঁদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, তাঁদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে আমরা নারীর সমতা প্রতিষ্ঠা করবো-এই অঙ্গীকার ব্যক্ত করে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

প্যানেলিষ্ট -২: জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ।

প্যানেল আলোচনার দ্বিতীয় বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের। পিকেএসএফ-এ প্রথম নারী দিবস পালনের রীতি চালু করার জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদ জানান পিকেএসএফ এর সম্মানিত সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদকে।

তিনি বলেন আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ডিজিটাল প্রযুক্তিকে কীভাবে আমরা নারী পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণের কাজে ব্যবহার করতে পারি। প্রযুক্তি হচ্ছে একটি হাতিয়ার । যার ফলাফল নির্ভর করে এর ব্যবহারের ওপর। কে কোন কাজে প্রযুক্তি ব্যবহার করবে তা নির্ভর করে ব্যবহারকারীর মননের ওপর। কাজেই প্রযুক্তির শুধু উপরিতলের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে অসমতা, বৈষম্য এগুলো আরো বাড়তে পারে। ইন্টারনেট ব্যবহারের কিন্তু অনেকগুলো 'বায়াস' আছে। কেবল উপরিতলে ইন্টারনেটের ব্যবহার বৃদ্ধি করলেই যে খুব ভালো কিছু হবে, তা নয়। এখন গ্লোবালি অনেক সাইকোলজিস্ট অনেক রিসার্চ করেছেন যে, ইন্টারনেট আসক্তি একটা ভয়ংকর বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সেখান থেকে অবসাদসহ নানা অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। ইন্টারনেট কেন ব্যবহার করছি এটা আমাদেরকে আগে ভালো করে বুঝতে হবে। তারপর সেটা ব্যবহার করে কীভাবে বৈষম্য দূর করা যায় সেটা ভাবতে হবে।

আজকাল ফেমিনিজম নিয়ে নানা রকমের কনফিউশন সৃষ্টি হয়েছে। কখনও মনে হয় যে পুরুষ নারীর প্রতিপক্ষ। আবার কখনও মনে হবে নারীরা পুরুষ হয়ে উঠতে চাচ্ছেন। নারীদের স্রষ্টা পুরুষদের থেকে শক্তিশালী করে তৈরি করেছেন। আমরা একটা ম্যামাল (স্তন্যপায়ী) সোসাইটি। ম্যামাল সোসাইটির কেন্দ্রে থাকেন নারীরা। সুতরাং নারীদের পিছিয়ে রেখে বা বাদ দিয়ে কখনোই এই সমাজ অগ্রসর হতে পারবে না। একটা সময়ে পুরুষদের কাজ ছিল শিকার করা, প্রটেকশন দেওয়া, যা মূলত পেশিশক্তির ওপর নির্ভরশীল। সেখান থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার একটা সংকীর্ণ দৃষ্টি তৈরি হয়েছিল বলে বিভিন্ন সমাজবিদ মনে করেন। সেই সংকীর্ণ দৃষ্টি থেকে প্রথমেই সম্পদের বণ্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। এই বৈষম্যের মূলেই অসাম্য, অর্থাৎ ইনইকুইটি।

পৃষ্ঠা নং-৮

কাজেই একটা ইনইকুইটি-সঞ্জাত সংস্কৃতি প্রাচীনকালেই জন্ম নিয়েছে যা এখনো চলমান। ইনইকুইটি থেকে ইনইকুয়্যালিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ইনইকুয়্যালিটি আবার ইনইকুইটির সংস্কৃতিকেই শক্তিশালী করছে। এটা একটা দুষ্টচক্রের মতো হয়ে গেছে। এই দুষ্ট চক্র যদি আমরা ভাঙ্গতে পারি তাহলে প্রযুক্তিসহ নানা কিছুকে আমরা এই বৈষম্য নিরসনে ব্যবহার করতে পারব। লিঙ্গ বৈষম্যের মূল কার্যকারণ নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হবে। আমাদের নারীরা দীর্ঘস্থায়ী উদ্বেগ এ ভোগেন যা সঞ্চারিত হয় পুরুষের মধ্যেও। ফলে সমাজ হিসেবে আমরা পিছিয়ে পড়ি। মানুষ একটা অখন্ড মানবিক সত্তা যা বিভাজিত। যার একটি হচ্ছে পুরুষ সত্তা ও আরেকটি নারী সত্তা। এই দুটো পরস্পরের পরিপূরক। কাজেই যদি আমরা মানবতার জয়গান গাইতে চাই, যদি অখন্ড মানবতাকে বিজয়ের শিখরে পৌঁছে দিতে চাই, তাহলে নারী ও পুরুষকে পরস্পরের পরিপূরক হতে হবে। আর সেটা করতে হলে যে সামাজিক প্রত্যয় দরকার, তার জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি হতে পারে একটা বড় বাহন।

কথিত আছে, 'যারে তুমি নিচে ফেলো, সে তোমারে বাধিবে যে নিচে,পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে'। সুতরাং নারীকে পশ্চাতে রেখে একটা সমাজ সুস্থ-সবলভাবে বিকশিত হতে পারবে না। ২০১৭ সালে বিহ্যাভিওরাল ইকোনমিক্স নিয়ে কাজ করে অর্থনীতিতে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন রিচার্ড থ্যালার। তাঁর জনপ্রিয় Nudge Theory এখন বিশ্বব্যাপী বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি হচ্ছে মানুষের সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দিকে ধাবিত করে আচরণগত পরিবর্তন আনা, যা কিনা ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে সহজেই করা যায়। চূড়ান্ত বিচারে উন্নয়ন হচ্ছে একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করার জন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন আনতে হবে সেগুলোর জন্যও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরে আমাদের সেই চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে যেন আমরা ইনইকুইটি-সঞ্জাত সংস্কৃতি থেকে চর্চার মাধ্যমে একটা ইকুইটেবল সোসাইটির সংস্কৃতিতে উপনীত হতে পারি। সেটার জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি নানা রকম অভিনব সমাধান আছে, যেমন অ্যাকসেস টু ফাইন্যান্স; ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা মেয়েদেরকে অ্যাকসেস টু ফাইন্যান্স বিষয়ে অবহিত করে দিতে পারি খুব সহজেই। সামনের যুগটা হবে ডিজিটাল শিক্ষার যুগ। গ্লোবালি উন্নত দেশগুলো ডিজিটাল শিক্ষায় অনেকে এগিয়ে গেছে। এর পরে আসে স্বাস্থ্যসেবা। দেশের গ্রামে-গঞ্জে বাংলাদেশের মেয়েরা নানান অসুস্থতায় আক্রান্ত। আমাদের যে, ডিজিটাল বেইজড হেলথ সার্ভিস সিস্টেম আছে, সেটি নারীদের এ ধরনের অসুস্থতা নিরাময়ে খুব বড় রকমের অবদান রাখতে পারে।

নারীর প্রতি যাতে কোন রকমের হয়রানি না করা হয় সে জন্য হাইকোর্টের দেয়া নির্দেশনা মোতাবেক পিকেএসএফ-এ একটি কমিটি আছে। নিকটতম আত্মীয়রা কাজ করলে আমরা যে-রকম পরিবেশ চাইতাম আমরা চেয়েছি পিকেএসএফ-এ যেন সেরকম কাজের পরিবেশ থাকে। আমাদের ২০০টি সহযোগী সংস্থার প্রায় এক লক্ষ কর্মীর মাধ্যমে প্রায় পৌনে দুই কোটি পরিবারে নানা সেবা পৌঁছে দিচ্ছি। আমাদের সহযোগী সংস্থাগুলোতেও আমরা একই রকম কমিটি করে দিয়েছি যাতে তারা হাইকোর্টের নির্দেশনা মেনে চলে। সহযোগী সংস্থাগুলোত নারী কর্মীর সংখ্যা ৩৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এটা আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে পিকেএসএফ একটি বৃহৎ টেকসই নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে। এই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে আমরা একটা বৈষম্যহীন সমাজের দিকে এগিয়ে যাবো যাতে করে আমরা একটা সুস্থ সবল জাতি হিসেবে, একটা মর্যাদাবান জাতি হিসেবে দ্রুত আত্মপ্রকাশ করতে পারি। পরিশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে জনাব মোঃ ফজলুল কাদের তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

৫.০ মুক্ত আলোচনা:

মুক্ত আলোচনা পর্বটি সঞ্চালনা করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি সকলকে নিজ নিজ নাম ও পরিচয় উল্লেখ করে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান।

ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম, সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ

আমরা যখন ঋণ কার্যক্রম শুরু করি তখন ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর নিশ্চিত করতে হতো। এখন সময় এসেছে যে ঋণ গ্রহীতার ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের জ্ঞান থাকাটা নিশ্চিত করার। ডিজিটাল প্রযুক্তির ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকই রয়েছে। তবে প্রজন্মকে ডিজিটাল প্রযুক্তির ইতিবাচক দিকে ধাবিত করার পেছনে মায়েদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। পরিবারের মা যদি নিজে সচেতন না হন, তাহলে সন্তানদের সচেতন করা সম্ভব হবে না। এ কারণে মায়েদের আরো সচেতন করে তুলতে হবে যাতে সন্তানদের প্রযুক্তি ব্যবহারের সুফল পাওয়া যায়।

পৃষ্ঠা নং-৯

ড. নমিতা হালদার এনডিসি: আমরা বোধহয় দেশব্যাপী এরকম কোনো কর্মশালা পরিচালনা করতে পারবো না। তবে আমরা আমাদের সহযোগী সংস্থাসমূহকে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পরামর্শ দিতে পারি।

ড. এ.কে.এম. নুরুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ

ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধা যদি আমরা নিতে চাই, তাহলে এর একটা শক্ত ভিত্তি তৈরি করতে হবে। অনেকেই প্রযুক্তির অপব্যবহারের বিষয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। ডিজিটাল প্রযুক্তির অপব্যবহারের ক্ষেত্র তৈরি হয়, কোনটি কী ব্যবহার তা না জানার কারণে। আমাদের বুঝতে হবে এটি একটি হাতিয়ার যার ভালো মন্দ সব রকমের ব্যবহারই রয়েছে। তবে ডিজিটাল প্রযুক্তিকে আমাদের আশীর্বাদ হিসেবেই গ্রহণ করা উচিত। আমাদের সন্তানদের Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) ধারণার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। আমাদের কন্যা সন্তানদের STEM বিষয়ে আরও আগ্রহী করে তুলতে আমাদের সচেতনভাবে চেষ্টা করতে হবে। এতে আমাদের বর্তমান প্রজন্ম ধীরে ধীরে প্রযুক্তি ব্যবহারে এগিয়ে যাবে। বর্তমানে আমরা যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টের সুবিধা পাচ্ছি তা আরও দশ-পনের বছর থাকবে। এ কারণে আমাদের এখন থেকেই ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

ড. নমিতা হালদার এনডিসি: আমি মনে করি যেহেতু পিকেএসএফ-এ পুরুষ সহকর্মী বেশি সেহেতু পিতাদের একটি বিরাট দায়িত্ব হচ্ছে তাঁদের কন্যা সন্তানদের STEM বিষয়ে আগ্রহী করে তোলার।

জনাব কাজী ফারজানা শারমিন, ডেপুটি চিফ কোঅর্ডিনেটর (ফাইনান্স), এসইআইপি প্রকল্প, পিকেএসএফ

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়েছে, ডিজিটাল প্রযুক্তি ও সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যাপারে পুরুষদের সচেতন হওয়ার প্রয়োজন বেশি। সেকারণে পুরুষদের লক্ষ্য করে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।

ড.নমিতা হালদার এনডিসি: আমরা কিন্তু শতভাগ ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে পিকেএসএফ-এ কাজ করি। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ অবস্থান থেকে পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশী ও নিজ নিজ সন্তানদের সচেতন করার সুযোগ রয়েছে। আমি সবাইকে আহ্বান জানাই যেন সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে চেষ্টা অব্যাহত রাখেন।

জনাব দিলীপ কুমার চক্রবর্তী, মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ

সন্তানদের সচেতন করার ব্যাপারে মায়েদের পাশাপাশি বাবাদেরও অনেক দায়িত্ব রয়েছে। বিশেষ করে প্রতিদিন সন্ধ্যায় যখন আমাদের ব্যস্ততা কম থাকে তখন আমাদের সন্তানদের ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের উত্তম চর্চাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারি। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আমাদের মাঠ পর্যায়ে নারী কর্মকর্তারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আর্থিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। অনেক জায়গায় পুরুষ কর্মকর্তাদের আবাসন সুবিধা রয়েছে কিন্তু নারী কর্মকর্তারা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাঁদের বাসা ভাড়া দিতে গিয়ে বেতনের একটি বড় অংশ ব্যয় হয়ে যায়। কিছু কিছু সংস্থা এই ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমরা এমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারি কিনা যেখানে নারী কর্মকর্তারাও যেন আবাসন সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

পৃষ্ঠা নং-১০

ড. নমিতা হালদার এনডিসি: এখন নারী কর্মকর্তাদের যদি কর্মস্থলে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয় তখন হয়ত পুরুষ সহকর্মীরাই বলবেন যে, তার স্বামীও তো কর্মজীবী, তাদের পরিবারে দুইজনই আয় করেন। এরকম প্রশ্ন কিন্তু পুরুষ কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকেই আসে। তারপরও আমি মনে করি এটি অত্যন্ত ভালো প্রস্তাব। এই ব্যাপারে সমতা আনয়ন করা যায় কিনা, বিশেষ করে যাদের কর্মস্থল থেকে বাড়ি অনেক দূরে বা যাদের ছোটো সন্তান রয়েছে, তাঁদের অগ্রাধিকার দিয়ে। সে ব্যাপারে আমরা সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে আলোচনা করবো। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়ে আমাদের সন্তানদের সচেতন করার ব্যাপারে আমাদের পিতা-মাতা সকলেরই দায়িত্ব রয়েছে মন্তব্য করে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুক্ত আলোচনা পর্বটির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৬.০ অতিথি বক্তার বক্তব্য:

জনাব সোনিয়া বশির কবির, ভাইস চেয়ার ও গভর্নিং কাউন্সিল মেম্বার, ইউনাইটেড ন্যাশন্স টেকনোলজি ব্যাংক।

জনাব সোনিয়া বশির কবির উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, সকলের বক্তব্য শুনে মনে হয়েছে যে, গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়েই আলোচনা হয়ে গেছে। তবুও আমি কিছু বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি ছোটবেলায় দুই ভাইয়ের সঙ্গে বড় হয়েছি। আমার বাবা আমাদের বলতেন যে, অন্ধকার যে বারান্দা আছে সেখান থেকে একটু দৌড় দিয়ে ঘুরে এসো। তখন ভয় লেগেছে তবুও করেছি। এরকম করে এক সময় দেখলাম যে আমি ভয়কে জয় করতে শিখে গেছি। এটা কিন্তু ছোটবেলা থেকেই শিখতে হয়। নারীদের ভীতিকর পরিবেশ থেকে বাঁচার জন্য শিশুকাল থেকেই মানসিক স্বাধীনতার চর্চা করতে হবে। একটি মেয়েকে যদি শিশুকাল থেকেই নিরাপত্তার খাতিরে তাঁর ভাই বা বাবা সাথে করে স্কুলে নিয়ে যান, তাহলে তাঁর জন্য মানসিক স্বাধীনতা অর্জন করা কঠিন হয়ে যায়। আপনারা আপনার সন্তানদের স্বাধীনতা দিন। প্রথমে একটু ভয় লাগতে পারে যে আসলেই পারবে কিনা কিন্তু দেখবেন ঠিকই পারবে। এখানে অনেকেই বলেছেন যে নারীরা কিন্তু পুরুষদের চেয়েও কিছু কিছু ব্যাপারে শক্তিশালী। সেই শক্তির বিকাশের জন্য আমাদের ছোটবেলা থেকেই সাহস দিতে হবে। ক্লাস এইট থেকে নাইনে ভর্তি হওয়ার সময় একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার ছিল যে সায়েন্স নাকি আর্টস-এ পড়বো। আমার গণিত ভালো লাগে, তাই সায়েন্স নিয়েছি। এদিকে আমার বন্ধুরা বলছিল যে তাঁদের গণিত ভয় লাগে তাই আর্টস-এ পড়তে চায়। এই ভয়ের ব্যাপারটি নিয়ে আমাদের গবেষণা করা উচিত যে কেন মেয়েরা প্রযুক্তি শিক্ষায় পিছিয়ে। প্রযুক্তি ভীতি কাটিয়ে না উঠলে নারীদের কখনও উন্নতি হবে না।

ফেসবুকের তথ্য অনুযায়ী ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিবেচনায় ঢাকা পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শহর। ফেসবুকের মধ্যে এমন একটি ব্যাপার আছে যে গ্রামের নারীরাও স্মার্টফোন কিনে সেখানে ফেসবুক ব্যবহার করেন, ব্যবসাও করেন। আমরা এফ-কমার্স এর কথা শুনেছি। এমনকি হোয়াটসঅ্যাপেও অনেক মানুষ ব্যবসা করছেন। ফেসবুক আসলে একটি সমস্যার সমাধান নিয়ে এসেছে। সমস্যাগুলোর সমাধান নিয়ে আসা আমাদেরও দায়িত্ব। একটি উদ্যোগ যদি প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাহলে সে খুব দ্রুত আগাতে পারে। প্রযুক্তি কোনো কঠিন ব্যাপার না। আপনি যে ধরনের ব্যবসাই করুন না কেন প্রযুক্তি আপনাকে অনুসরণ করবে। এক্ষেত্রে ফেসবুক একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। অন্যান্য প্রযুক্তি অনেকেই ভয় পায় কিন্তু ফেসবুক ব্যবহার করতে কেউ ভয় পায় না। ফেসবুক আমাদের জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডিজিটাল প্রযুক্তিতে আমরা বেশি আগাতে না পারলেও সোশ্যাল মিডিয়ায় আমরা অনেক এগিয়ে গেছি। ফেসবুক এটা প্রমাণ করে দিয়েছে যে আমরা স্মার্ট ফোন কিনতে পারি এবং আমরা ডেটাও কিনতে পারি কিন্তু সমস্যা হচ্ছে প্রযুক্তির প্রাসঙ্গিকতা। আমি বিভিন্ন সময় এসএমই ফাউন্ডেশন, BIDA সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রামের নারী উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা অনেকেই স্মার্টফোনে ডাটা প্যাকেজ কিনে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। কেউ কেউ বলেছেন তাঁদের ফোনে দুটি অ্যাপ ডাউনলোড করা হয়েছে যার মধ্যে একটি হলো 'টালিখাতা'। যখন বলেছি যে আপনি এই অ্যাপ দিয়ে কী করেন, দেখাতে পারবেন কিনা তখন তাঁরা বলেছেন যে, তাঁদের পাসওয়ার্ডই মনে নেই। একজন নিরক্ষর নারীকে যদি একটা ফোনে অপরিচিত অ্যাপ ডাউনলোড করিয়ে বলা হয় ব্যবহার করতে, তাঁর প্রথম প্রশ্ন হবে কেন এটা ব্যবহার করবো, আমি তো ভালো আছি। এতে উদ্বেগ আরো বাড়বে। ফলে সমস্যার সঠিক সমাধান হবে না।

পৃষ্ঠা নং-১১

সুতরাং যেদিন ডিভাইসে এক্সেস, সাশ্রয়ী মূল্যে সংযোগ, সামর্থ্য, প্রাসঙ্গিকতা এবং পরিষেবা পাওয়ার জন্য নারী গ্রাহকদের অর্থ প্রদান করা ইচ্ছা-এই বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে পারবো তখন বলতে পারবো যে আমরা কিছু করতে পেরেছি। তাহলে নারীদের তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়বে। আমাদের দেশে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার কথা হিসেব না করে অনেক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ কারণে নারীরা তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ হচ্ছেন না। হাজার হাজার নারীকে আমরা প্রশিক্ষণ দিয়েছি, কেবল এটি বলার জন্যই আমরা প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। পুরুষদের সাথে সাথে নারীদেরও অন্যান্য সকল বিষয়ের পাশাপাশি প্রযুক্তিগত শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এই অন্তর্ভুক্তির কাজে পুরুষদেরও যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। মুক্ত আলোচনায় একজন ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড-এর কথা বলেছেন। আমার মনে হয় ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড সহ আমাদের মোট চারটি ডিভিডেন্ড রয়েছে। বাংলাদেশে ১৬ কোটি মানুষ ৫৬ হাজার বর্গমাইল এলাকায় থাকেন। সুতরাং আমাদের ঘনত্ব লভ্যাংশ (density dividend) রয়েছে। আমাদের জনসংখ্যার ৫০ ভাগই নারী। সুতরাং আমাদের লিঙ্গ লভ্যাংশ (gender dividend) রয়েছে এবং আমার সবচেয়ে পছন্দের হলো তথ্য লভ্যাংশ (data dividend)। ১৬ কোটি মানুষের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে আমরা যদি সেগুলোর সমাধান দিতে পারি, তাহলে সেখানে যে পরিমাণ তথ্য উৎপন্ন হবে সেটি হবে একটি বিরাট শক্তি।

এখন চারপাশে সাইবার ক্রাইম অনেক বাড়ছে। একটা বিষয় মনে করে দেখবেন যে আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন প্রত্যেক স্কুলেই একটা করে উৎপীড়ক (bully) থাকতো। ওরা আমাকে কখনও বিরক্ত করতে পারতো না, কারণ আমি সমুচিত জবাব দিয়ে দিতাম। কিন্তু আমার শান্তশিষ্ট, লাজুক বন্ধুটি তার অত্যাচার থেকে রক্ষা পায়নি। সাইবার ক্রাইমের ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি প্রযোজ্য। একজন সাইবার অপরাধের স্বীকার তখনই হয় যখন সে ভয় পায়। এই ভয়কে জয় করতে হবে। এটা সেই স্কুলের উৎপীড়কের মতোই যে কিনা আপনার টিফিন নিয়ে যেতো, আপনাকে মারতো কিন্তু তাঁকে কেউ কিছু বলতে পারতো না। সাইবার ক্রাইম এড়ানোর জন্য যদিও কিছু সচেতনতা ও শিক্ষা দরকার আছে কিন্তু এর বড় অংশই এড়ানো যাবে যদি আমরা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই এবং এদের অগ্রাহ্য করতে শিখি।

এখন ডিজিটাল যুগ চলছে। ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা স্মার্ট অর্থনীতি গড়তে চাই। এর জন্য আমরা নানা রকম কার্যক্রম ও প্রকল্প হাতে নিয়েছি। এর জন্য আমাদের নারীদের কেবল আর্থিক বিষয়াবলী সম্পর্কে জানালে চলবে না, নারীদের অগ্রগতি হবে যখন তাঁদের অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এছাড়াও, ডিজিটাল লিটারেসি বলতে আমরা যা করি তার অনেক কিছুই অপ্রয়োজনীয়। লক্ষ্য করবেন কীভাবে ফেইসবুক ব্যবহার করতে হবে সেটা কিন্তু আমাদের কেউ শিখিয়ে দেয়নি। মানুষ যখন দেখেছে যে এটা ভালো লাগছে, ব্যবসা করতে পারছে, তথ্য পাচ্ছে তখন নিজে থেকেই তার ব্যবহার রপ্ত করেছে। আমাদের নারীদের এমন প্রযুক্তি হাতে তুলে দিতে হবে যাতে তাঁরা সেগুলো প্রশিক্ষণ ছাড়াই ব্যবহার করতে পারে। তাঁরা যেন নিজের ইচ্ছাতেই সেগুলো ব্যবহার করতে পারে। আমরা এখনও সেই পর্যায়ে যাইনি। তবে, ভবিষ্যতে এটাই করতে হবে। সবশেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে জনাব সোনিয়া বশির তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

৭.০ চেয়ারপার্সন-এর বক্তব্য:
ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ।

সেমিনারের চেয়ারপার্সন ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ তাঁর বক্তব্যের শুরুতে বলেন, আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে আমাদের এই আয়োজন। জনাব ফজলুল কাদের (অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ) আমাকে কথাটি মনে করিয়ে দিলেন যে, আমি যখন প্রথম পিকেএসএফ-এ যোগদান করি, তখন পিকেএসএফ-এ নারী দিবস পালিত হতো না। যদিও পিকেএসএফ-এর অর্থায়ন প্রায় শতভাগ নারীদের মাধ্যমেই হতো। আমি যখন আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের প্রস্তাব করি তখন একটা আপত্তি আসে। এমনকি বলা হয়েছে যে, এ আবার কোন উৎপাত। সেখান থেকে আমরা অনেক দূরে চলে আসছি। এখন প্রতিবছর নিয়মিত দিবসটি এখানে পালিত হয়। ড. নমিতা হালদার প্রথম নারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তাঁর আগে যারা পুরুষ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন, তাঁরাও দিবসটি পালন করেছেন। একদিক থেকে চিন্তা করলে মনে হবে যে এরকম দিবস পালন আসলে গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমরা যে কাজ করি সেটি ঠিকমতো করলেই হলো। কিন্তু এরকম দিবস পালনের মাধ্যমে আমরা নিজেদের মনে করিয়ে দিতে পারি যে আমাদের যেখানে পৌঁছানোর কথা সেখান থেকে অনেক পিছিয়ে আছি। কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, 'বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর'। এই অংশটুকু আমরা সবসময় শুনি, সবাই জানি। কিন্তু এর পরের লাইন দুটিও গুরুত্বপূর্ণ। কবি বলছেন, 'বিশ্বে যা কিছু এল পাপ তাপ বেদনা অশ্রুবারি, অর্ধেক তার আনিয়াছে নর অর্ধেক তার নারী'।

পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
৮৮-০২২২২২১৮৩৩১-৩৩, ০২২২২২১৮৩৩৫-৩৯
৮৮-০২২২২২১৮৩৪১, ০২২২২২১৮৩৪৩
pksf@pksf.org.bd
facebook.com/pksf.org
youtube.com/@PKSF1990

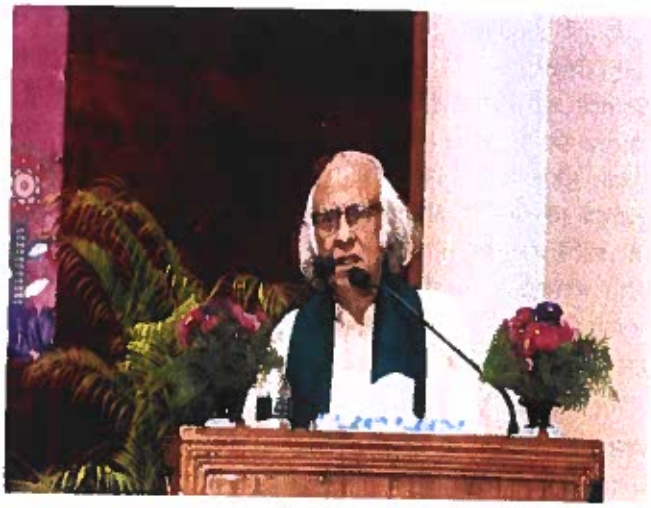

সকল কল্যাণকর অর্জনে নারীর অবদান আছে। সেটা অর্ধেক, নাকি কম বেশি সেটা বিবেচনা করার আছে। তবে 'পাপ তাপ বেদনা' সৃষ্টিতে নারীর অবদান অনেক অনেক কম। কারণ নারীদের সবসময় অধস্তন ভাবা হতো। আর পুরুষকে বিবেচনা করা হতো তাঁর মালিক হিসেবে। সেখান থেকে আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি। তবুও আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারিনি। আমাদের আরো অনেক দূর যেতে হবে। তিনি বলেন, নারীদের গৃহস্থালি কাজের মূল্যায়নের কথা উঠে এসেছে পূর্বের আলোচনায়। সম্ভবত ১৯৭৯ সালে একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিলো যে, বাড়িতে নারীরা যা কাজ করেন সেটা জিডিপি র অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সেই সিদ্ধান্তের ফলে নারীদের কাজে অংশগ্রহণ অনেক বেড়ে গিয়েছিলো। এটি এক বছর চালু ছিল যা পরের বছরই বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশে আমরা অনেক ভালো আছি। যেমন এখন ঘরের বাইরে উপার্জনক্ষম কাজে যুক্ত আছে প্রায় ৩৭% নারী। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোতে এই সংখ্যা কম। নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে অগ্রগামী। গত কয়েক বছর ধরেই আমরা এই সূচকে এগিয়ে আছি। তার মানে এই নয় যে আমাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে এবং নারীদের যেই অবস্থানে থাকার কথা সেখানে আছে।

মাঠ পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর যে অর্থায়ন করা হয় তার প্রায় ৯৬-৯৭% করা হয় নারীদের মাধ্যমে। আমি যখন পিকেএসএফ এ সভাপতি হিসেবে যোগদান করি তখন দেখলাম ঋণ গ্রহীতার মধ্যে মাত্র ১% নারী সরাসরি সেই অর্থ ব্যবহারের সঙ্গে সংযুক্ত হন। নারীরা সাধারণত বিয়ের আগে বাবার কাছে, বিয়ের পরে স্বামীর কাছে এবং বৃদ্ধকালে সন্তানের কাছে নির্ভরশীল থাকেন। এই পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। কিন্তু আমাদের যেখানে থাকার কথা তার ধারেকাছেও আমরা নেই। আমার জানা মতে প্রায় ২০% নারী কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, নেতৃত্ব দেন, এবং তাঁর মতামত ও অংশগ্রহণ থাকে। সেটা আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। আমাদের দিক থেকে সেই চেষ্টাও বাড়াতে হবে। জয়িতা ফাউন্ডেশন এই চেষ্টা করছে বলে শুনলাম। কিন্তু সবখানেই নানা প্রতিবন্ধকতা আছে। সরকারে নীতি আছে যে ২৫ লাখ টাকা ঋণ গ্রহণ করতে কোনো জামানত লাগবে না। কিন্তু ব্যাংকে গেলে ৩-৫ লাখ টাকা ঋণ চাইলেই তারা জামানত চায়। আমাদের দেশে আইন আছে, নীতিমালা আছে, এমনকি অনেক কর্মসূচিও আছে। সমস্যা হলো, যারা এগুলো বাস্তবায়ন করেন তারা এখনও সেই চিরায়ত ধ্যানধারণা দ্বারা তাড়িত। আমাদের মানসিকতায় এখনও বড় সমস্যা রয়ে গেছে। বিশেষ করে পুরুষদের মানসিকতায় এই সমস্যা রয়েছে। এমনকি নারীদের মধ্যে এরকম ধারণা রয়েছে। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, পিকেএসএফ-এর কর্মসূচি দেখতে গিয়ে একবার এক নারীর মুখোমুখি হই যার বয়স প্রায় ৫০-এর কাছাকাছি। তিনি বাড়িতে গরু, ছাগল পালনসহ শাকসবজির চাষ করছেন সুন্দর করে। তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করলাম এই কাজগুলো কে করে। তখন সেই নারী বললেন, এগুলো আমি কিছু করি না। তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, এই গরুকে, হাঁসগুলোকে কে খাবার দেয়। তখন তিনি বললেন যে এই কাজগুলো তিনিই করেন। যুগ যুগ ধরে তাঁর মানসিকতা গড়ে উঠেছে যে তিনি কিছু করেন না। এই মানসিকতা থেকেও আমাদের বেরিয়ে আসা দরকার। আরেক বাড়িতে গেলাম যেখানে স্বামী-স্ত্রী অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সের। তাঁরা সমৃদ্ধি বাড়ি করেছে, হাঁস-মুরগি পালন করছে। তখন ওই পুরুষকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তাঁদের আয় কেমন হচ্ছে, ব্যাংকে কোনো অর্থ জমা করতে পারছে কিনা। তখন সে বললো যে এগুলো কিছুই সে জানে না, তাঁর স্ত্রী সব বলতে পারবে। তাঁর স্ত্রী আসলেই সব হিসেব বলে দিতে পেরেছিলো। এরকম অংশীদারি জীবন গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। পুরুষ এবং নারী একে অপরের পরিপূরক। পুরুষ ও নারীর আলাদা জগৎ হতে পারে না। কেউ কেউ আছেন পুরুষকে বাদ দিয়ে নারীবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চান। আর পুরুষরা সারাক্ষণই চেষ্টায় থাকেন নারীদের বাদ দিয়ে এগিয়ে যেতে। এই দুই দলই, বিশেষ করে পুরুষরা যদি এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে না আসতে পারেন তাহলে আমরা যতই নীতিমালা করি, আইন করি, বক্তৃতা দেই, বাস্তবে আমাদের কোনো অগ্রগতি ঘটবে না। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৫ আসলে নারী পুরুষ বৈষম্য নিয়েই। যখন এটা নিয়ে আলোচনা হয়, তখন ওপেন ওয়ার্কিং গ্রুপ-এ আমি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছি। এমনকি উন্নত বিশ্বেও এই বিষয়গুলো নিয়ে জোরেসোরে আলোচনা হয়েছিল। ওই সময় জাপানে কর্পোরেট জগতের শীর্ষস্থানের মাত্র ৭% দখল ছিল নারীদের।

পৃষ্ঠা নং ১৩

কাজেই নারীরা কেবল বাংলাদেশে বা উন্নয়নশীল দেশে পিছিয়ে আছে তা নয়। উন্নত বিশ্বেও বৈষম্য আছে। কাজেই তাদের অনুকরণ না করে নিজেদের মতো করেই সাম্যের কথা বলতে হবে। কারণ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্যই তো সাম্য। নারী, পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে সেটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রেই আছে। আর মানুষকে কেন্দ্র করেই আমাদের উন্নয়ন সেটাও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম চেতনা। আমাদের সংবিধান অনুযায়ী এই দেশের প্রতিটি নাগরিক দেশের মালিক। প্রত্যেকের অধিকার সমান। বঙ্গবন্ধু এটা সবসময় বলতেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেদিন আমাদের এটা মনে করিয়ে দিয়েছেন যে এমনকি প্রান্তিক পর্যায়ের প্রত্যেক নাগরিকও দেশের মালিক। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অনুসরণ করেই আমরা চেষ্টা করছি মানুষকে কেন্দ্র করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার। আলোচনায় প্রশিক্ষণের বিষয়টি উঠে এসেছে। মানুষের দক্ষতা উন্নয়ন করার জন্য আমরা প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে দক্ষ করার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হলেও তাঁদের নৈতিকতার উন্নয়নে কোনো প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না। পিকেএসএফ-এর আওতায় ২ লাখ ৬০ হাজার তরুণকে নৈতিকতার ওপরে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তবে সবকিছুর সমষ্টি হচ্ছে দেশপ্রেম। আমাদের সবার মধ্যে যদি দেশপ্রেম জাগ্রত হয়, তাহলে যে-সকল বৈষম্যের কথা বললাম সেগুলো থাকতে পারে না।

এবার নারী দিবসের প্রতিপাদ্য হলো DigitAll. সবাইকে তথ্যপ্রযুক্তির সাথে যুক্ত হতে হবে এবং প্রযুক্তির উদ্ভাবনী ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা সাম্য প্রতিষ্ঠা করবো। আমার মনে হয় এর ঠিক উল্টোটা ঘটছে এখন। প্রযুক্তি ব্যবহার করে নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র সবার মাঝেই বৈষম্য বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। যাঁদের কাছে অর্থ আছে, ক্ষমতা আছে তাঁরাই প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ করে। যাঁদের কাছে ক্ষমতা আছে তাঁরা যেখানেই থাকুক না কেন, তাঁরা আইন নিজের মতো করে তৈরি করে নেয় বা প্রচলিত আইন তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। এটা শুধু বাংলাদেশেই না, পৃথিবীর অনেক দেশেই ঘটছে। সুতরাং ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাঁর বক্তব্যে যথার্থই বলেছেন যে, প্রযুক্তি ব্যবহারে আমাদের অনেক সতর্ক হতে হবে। প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সবাই সমান সুযোগ পাচ্ছে কিনা সেটিও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। অনেকেই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা বলেন। আমার কাছে কিছু কিছু ব্যাপার হাস্যকর মনে হয়। আমরা দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবে যুক্ত হতে পারিনি। আমাদের এখানে গণউৎপাদন (mass production) হয়নি, আমাদের উৎপাদন, বিপণন ও বাজারের সঙ্গে সাধারণ মানুষ যুক্ত হতে পারেনি। এখন আবার আমরা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা বলছি। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা বিগ ডাটা ব্যবহার করছি, ব্লকচেইন ব্যবহার করছি। এছাড়াও, ড্রোন বা রোবটিক প্রযুক্তিও আমরা ব্যবহার করছি। তবে এটা দিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে আমাদের কতগুলো মূল বিষয় করতে হবে। যেমন, মোবাইল ফোনের ব্যবহার। 'কিউকে ফাউন্ডেশন' এর মাধ্যমে ১০টি কলেজের শিক্ষার্থীদের একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করতে গিয়ে দেখি অর্ধেকের বেশি শিক্ষার্থীর মোবাইল ফোনই নেই। কারো কারো পরিবারে সবার জন্য ১টি ফোন আছে। সেই একটা ফোন দিয়ে তো আমরা তাঁকে ওই প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করতে পারছি না। আমি ভাবতাম সবার কাছে ফোন আছে। যাঁদের অনেক টাকা আছে তাঁদের কারো কারো ১০-২০টা ফোন আবার অনেকের কাছে একটিও নেই। এই কাজে বিভিন্ন স্কুল কলেজে গিয়ে দেখেছি সরকার সেখানে একটি দুটি কম্পিউটার দিয়েছে কিন্তু সেগুলো শেখানোর লোক নেই বা ব্যবহার করার মতো প্রশিক্ষিত লোক নেই। কাজেই একটা বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে। আর আমাদের মেয়েরা আরও পেছনে রয়ে যাচ্ছে। কাজেই আমাদের সেই পারিপার্শ্বিকতা ও অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে যাতে করে ডিজিটাল ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণ করতে পারি। অনেক সময় সাধারণ নিয়ম কানুনের ভেতরে আটকে থাকার কারণে অনেক কিছু চাইলেও করতে পারি না। তবে পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে আমরা অনেক সময় অনেক কিছু করেছি। এখনও করছি। একটা জায়গায় গিয়ে ড. নমিতা হালদার দেখলেন যে মেয়েরা স্কুলে যেতে পারছে না। সাইকেল হলে তাঁরা যেতে পারবে। এরপরে ৭৫জন মেয়েকে সাইকেল কিনে দেওয়া হলো। এটা তো আমাদের প্রচলিত কাজ নয় ও নিয়মের বাইরে গিয়ে করা। আমরা যদি প্রচলিত নিয়মের মধ্যেই থাকতাম তাহলে কিন্তু এই কাজটি করা হতো না। কাজেই আমাদের প্রচলিত ধারণার বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে, মুক্ত মন নিয়ে মুক্ত চিন্তা ধারণ করে এগিয়ে যেতে হবে।

একটা কথা বলে শেষ করি। জাপান একটা ধারণা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে- সোসাইটি ফাইভ। এর মানে হচ্ছে প্রযুক্তির ব্যবহারে শুধু অর্থনৈতিক দিক নয়, সামাজিক দিকও বিবেচিত হবে। আমরা যদি অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে সামাজিক দিক বিবেচনা করি তাহলে সবক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা সম্ভব হবে। এইজন্য তাঁরা প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বজনীন করেছে। জাপান উন্নতির এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে তারা প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বজনীন করতে সক্ষম হচ্ছে। আমাদেরও শুধু অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, সামাজিক বিভিন্ন সমস্যাও সমাধান করতে হবে প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে।

পৃষ্ঠা নং ১৪

আমাদের প্রধানমন্ত্রীর 'স্মার্ট বাংলাদেশ' চিন্তার সাথে যদি যুক্ত করি তাহলে দেখবো, 'স্মার্ট বাংলাদেশ', 'স্মার্ট সোসাইটি', 'স্মার্ট সরকার', এবং 'স্মার্ট অর্থনীতি' স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে এই চারটি অনুষঙ্গ প্রয়োজন হবে। স্মার্ট বাংলাদেশের ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে আমাদের যাত্রাপথে যত জঞ্জাল আছে সেগুলো দূর করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে জঞ্জাল তো দূর হচ্ছেই না বরং বাড়ছে। সুতরাং এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন করতে পারি। তা না হলে স্মার্ট বাংলাদেশ বলি আর উন্নত বাংলাদেশ বলি, বা উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ (যেটা আমরা ২০৩১ সালের মধ্যে হতে চাই) তা গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। যদি অল্প কিছু সংখ্যক মানুষের আয় অনেক বেড়ে যায় তাহলে হয়ত আমরা উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ হয়ে যাবো। তার মানে এই নয় যে দেশে সাম্য প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে, প্রত্যেকে তাঁর সব মানবাধিকার ভোগ করবে, সবাই মানব মর্যাদায় বসবাস করবে। এখানেই আসে নারী-পুরুষ মিলে একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়টি। এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে দুটি দিক আছে। একটি হচ্ছে এগিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা এবং অপরটি হচ্ছে অগ্রযাত্রা থেকে প্রাপ্ত সুফলের সুষম বণ্টন। এই দুটি দিকেই আমাদের নজর দিতে হবে। আমাদের প্রবৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয় অনেক বেড়েছে। কিন্তু এটি কার কাছে যাচ্ছে সেদিকে আমাদের অনেক বেশি নজর দিতে হবে। আর আমাদের চিন্তাভাবনা যেন বাস্তবে রূপায়িত হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

আমি আশা করি যে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ একসঙ্গে মানব মর্যাদায় বসবাস করবে। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ তাঁর বক্তব্য শেষ করেন এবং সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তারিখ: ১৩ আগস্ট ২০২৩

(ড. নমিতা হালদার এনডিসি)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
৮৮-০২২২২২১৮৩৩১-৩৩, ০২২২২২১৮৩৩৫-৩৯
৮৮-০২২২২২১৮৩৪১, ০২২২২২১৮৩৪৩
pksf@pksf.org.bd
facebook.com/pksf.org
youtube.com/@PKSF1990